প্রথম অধ্যায়

রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা-গবেষণা চর্চা ঃ রবীন্দ্রজন্ম শতবর্ষ থেকে এক দশক

(১৯৬১—১৯৭০)

> ‘‘স্রষ্টা এবং সমালোচক, রচয়িতা এবং নিরীক্ষক, শিল্পী ও ভাবুক সর্বদা একই প্রতিভার বশীভূত হয় না। হলে কিন্তু আশা করা যায় যে, সৃষ্টি, শিল্প বা রচনা স্বেচ্ছাচারিতার পথে লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হয়ে নির্দিষ্ট নীতি-নিয়মের অঙ্গীভূত হয়। তেমনি সমালোচনা, বিচার বা আলোচনায় স্রষ্টার আপন অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়ে তাকে অধিকতর বাস্তব ও সত্যনিষ্ঠ করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনা করেছেন, বিশেষভাবে তাঁর আপন সাহিত্যসৃষ্টির মানদণ্ডে পরীক্ষিত বলেই তা সত্য হয়ে উঠেছে। সেই কারণে সাহিত্য সমালোচক রবীন্দ্রনাথ কবি স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথেরই ভাষ্যকার।’’[১]

রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য অরুণকুমার বসুর এই আশ্চর্য সুন্দর উক্তিটি রবীন্দ্রনাথের সংগীত সম্পর্কিত আলোচনা—সম্পর্কেও উল্লেখ করা যায় অনায়াসেই। কারণ কবি

নিজে সারাজীবন সংগীত বিষয়ক যে সমস্ত আলোচনা-বিশ্লেষণ করেছেন, তা শুধুমাত্র একজন সংগীত বিশেষজ্ঞ বা সংগীত সমালোচকের অভিমত নয়, নিজের বর্ণময় সাংগীতিক জীবনের অসীম অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে উজাড় করে সেই বিশ্লেষণের গুরুত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। কবি নিজেই ছিলেন সুরকার ও গীতিকার, তাই তাঁর আপন সংগীতচিন্তায় নিজের বহুমাত্রিক জীবনের ও অভিজ্ঞতার মূল্য স্বীকৃত হয়েছে। তাঁর 'সংগীতচিন্তা' গ্রন্থটি শুধুমাত্র যে কোনো রবীন্দ্রসংগীত গায়কের কাছেই নয়, যে কোন সংগীত শিল্পীর নিকটই গীতার মতো অবশ্যপাঠ্য।

যদিও আমরা একথাও সবিনয়ে স্বীকার করি যে 'সংগীত চিন্তা' গ্রন্থটিকে মাথায় রেখেও পরবর্তী কালে রবীন্দ্রসঙ্গীত পিপাসু পাঠক, গবেষক, আলোচক, যারাই এ বিষয়ে তাঁদের আপন মতামতকে তুলে ধরেছেন নানাবিধ গ্রন্থে, সেগুলোকেও খাটো করে দেখার কোন উপায় নেই। স্বল্প সংখ্যক গ্রন্থ বাদ দিলে অধিকাংশ গ্রন্থই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভিন্ন মতামত আমাদের থাকতেই পারে, কিন্তু এগুলোকে বাদ দিয়ে তা ভাবার কোন অবকাশ নেই।

১৯৬১ অর্থাৎ রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষকে সামনে রেখে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার ও প্রসারের যে বিপুল জোয়ার এসেছিল, তার প্রভাব লক্ষ করা যায় এই সময়কালে প্রকাশিত বেশ কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা গ্রন্থেও। রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ, শিল্পী, গবেষকদের রচনায় রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা-ভাবনার নানা দিক উঠে এসেছে এই গ্রন্থগুলোতে। রবীন্দ্রসঙ্গীত নিছক মনোরঞ্জনে সীমায়িত নয়, রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাণীর গভীরতা আমাদের অবলম্বন; তাছাড়া রবীন্দ্রসঙ্গীতে কণ্ঠ সৌন্দর্যের পাশাপাশি কাব্য ও তাত্ত্বিক ভাবনা সার্থক পরিবেশনে সহায়ক—এ সব দিকগুলোই উপস্থাপিত হয়েছে অসংখ্য রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞদের লেখনীতে। ১৯৬১ থেকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কালসীমায় প্রকাশিত রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা-সমালোচনা বিষয়ক গ্রন্থাবলীর

মধ্য থেকে আমরা নির্বাচন করেছি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, যেগুলো রবীন্দ্রসঙ্গীতের যথাযথ চর্চায় শুধুমাত্র সহায়ক নয়, অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ বলেই বিবেচিত হয়েছে।

।। এক।।

প্রথমেই উল্লেখ করতে চাই, রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ প্রফুল্লকুমার দাস-এর 'রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গ প্রথম খণ্ড' গ্রন্থটি। প্রকাশকাল ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ। গ্রন্থের সূচিপত্রে রয়েছে---সূচনা/প্রাথমিক মানঃ--- প্রথম পাঠক্রম-শিক্ষণীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত, রাগসঙ্গীতাংশ।। 'দ্বাদশস্বর', তিন সপ্তক, মাত্রা ও স্বর সাধনা। তাল।। দাদ্‌রা ও কাহার্ বা। দ্বিতীয় পাঠক্রম-শিক্ষণীয় রবীন্দ্রসংগীত, রাগসঙ্গীতাংশ।। স্বর-সাধনা, তাল—তেওরা, একতাল ও ত্রিতাল। তৃতীয় পাঠক্রম-শিক্ষণীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত, রাগসঙ্গীতাংশ ।। স্বর সাধনা। বিলাবল ও কাফি রাগ। তাল।। পূর্ব পাঠক্রমে শেখা তাল ও ঝম্পক। চতুর্থ পাঠক্রম-শিক্ষণীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত, রাগসঙ্গীতাংশ।। ইমন ও খাম্বাজ রাগ। তাল।। পূর্ব পাঠ্যক্রমের তাল ও ২/২ মাত্রার ছন্দ।

মাধ্যমিক মানঃ পঞ্চম পাঠক্রম—শিক্ষণীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত, রাগসঙ্গীতাংশ।। বিলাবল, ইমন, খাম্বাজ, কাফি, ভৈরবী ও ভূপালী রাগ। তাল।। লয় সাধন। দাদরা, কাহারবা, একতাল, ত্রিতাল, তেওরা, ঝম্পক ও ২/২ মাত্রার ছন্দ। ষষ্ঠ পাঠক্রম—শিক্ষণীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত, রাগসঙ্গীতাংশ।। ভৈরব, হাম্বীর, বেহাগ, কেদার, দেশ, তিলককামোদ, বৃন্দাবনীসারং ও ভীমপলশ্রী। তাল।। পূর্ব পাঠক্রমের তাল ও ২/৪ মাত্রার ছন্দ।

অন্ত্যমান ঃ সপ্তম পাঠক্রম—শিক্ষনীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত, রাগসঙ্গীতাংশ।। পূর্বী, আশাবরী, বাগেশ্রী, পিলু, জৌনপুরী, মালকোষ, ছায়ানট, জয়জয়ন্তী ও রামকেলি

রাগ। তাল।। চৌতাল, সুরফাঁকতাল, ধামার, রূপকড়া, নবতাল, একাদশী ও পূর্ব পাঠক্রমের তাল। তত্ত্বসিদ্ধ অংশ।। তত্ত্বের কয়েকটি দিক, বিষয়বস্তু ঃ পর্যায় ও উপপর্যায়, সুর ঃ সঙ্গীতের মূলতত্ত্ব, স্বর ও শ্রুতি-তত্ত্ব, রাগ ঃ বিভিন্ন সংজ্ঞা, মাত্রা ছন্দ ও তাল, রবীন্দ্রসঙ্গীতে ব্যবহৃত তাল, লয়, কলিগঠন, স্বরলিপি ও সংগীত লিপি, আকার মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি, উচ্চারণ, সঙ্গীতলিপি পাঠ, গায়কের গুণ, গায়কের দোষ। অষ্টম পাঠক্রম—শিক্ষণীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত, রাগসঙ্গীতাংশ।। যোগিয়া, ললিত, টৌড়ী, মুলতান, শ্রী, সোহিনী, বাহার, দরবারী কানাড়া, আড়ানা, পরজ ও বসন্ত রাগ।

তত্ত্বসিদ্ধ অংশ।। রাগ, রাগালাপ ও রাগ-রূপায়ণ, রাগের প্রকারভেদ, ধ্রুপদ, হোরি, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি, তারানা (তেলেনা), ত্রিবট, চতুরঙ্গ, ভজন, বাংলা গান, বাংলার লোকসঙ্গীত, মূল হিন্দীগান ও ভাঙা রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষঙ্গ, গান ও গায়কি, সঙ্গীতলিপি, শ্রুতিলিখন, সঙ্গীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারা।

নির্ঘণ্ট/উল্লেখপঞ্জী।

১৭১ পৃষ্ঠার 'রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গ (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থটির পুনঃমুদ্রিত সংস্করণ ৭ অগ্রহায়ণ ১৪১৪ অর্থাৎ নভেম্বর ২০০৭ এর। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে সংস্করণ আর পুনঃমুদ্রণের ধারা এই গ্রন্থটির অপরিসীম গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতার মাত্রাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই গ্রন্থে লেখক জানিয়েছেন যে, রবীন্দ্রসঙ্গীত যথাযথভাবে আয়ত্ত করতে হলে বিধিবদ্ধ শিক্ষার প্রয়োজন। আর এধরনের শিক্ষার জন্য ক্রমানুযায়ী মানের একটি পাঠক্রম প্রবর্তন করার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থের পরিকল্পনা। রবীন্দ্রসঙ্গীত -শিক্ষার্থীদের যে সমস্ত সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় তার সমাধান

পরিকল্পনা, রবীন্দ্রসঙ্গীতাদর্শ ও রাগসঙ্গীতের ভিত্তিতে পাঠক্রমগুলি সঙ্গীত-বিদ্যালয় বা স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্যেই পরিকল্পিত হয়েছে। ক্রিয়াসিদ্ধ অংশে বিশেষ করে রয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি নির্দেশের সঙ্গে কোন্ গান, কোন্ স্বর থেকে আরম্ভ, সমের স্থান, পর্যায়, তাল ইত্যাদি প্রসঙ্গ। বিভিন্ন পাঠক্রমের সঙ্গীত-শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষকের সাহায্যে বিভিন্ন রাগ সম্বন্ধে ও যথাযথভাবে কণ্ঠপ্রস্তুতিতে বিশেষ শিক্ষা পেতে পারেন গ্রন্থ মধ্যে এ সম্পর্কে লেখক স্পষ্ট ধারণা ছবিরমত তুলে ধরেছেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীত রাগসঙ্গীতের সাথে যুক্ত হয়েও আপান বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র—এ কথা মূলগান ও তার ভাঙা রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি সংকলনের মধ্য দিয়ে প্রফুল্লকুমার দাস দেখিয়েছেন। বিশেষ করে প্রাথমিক-মাধ্যমিক-অন্ত্য এই ৩টি মান বা স্তরে ৮টি পাঠক্রম রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ দিক দর্শন করে । রবীন্দ্রসঙ্গীতের যথাযথ সাধনায় নিঃসন্দেহে এই গ্রন্থটি একটি বিশেষস্থান অধিকার করে রয়েছে। প্রত্যেক রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিক্ষার্থীর এই বইটি অবশ্যপাঠ্য বলে আমাদের মনে হয়।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর 'রবীন্দ্রনাথের গান' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে। আলোচ্য গ্রন্থটি ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে সংশোধিত ও পরিমার্জিত পঞ্চম সংস্করণ হিসাবে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের সূচিতে রয়েছে—সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্রমবিকাশ, রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুরবৈচিত্র্য, রবীন্দ্রসঙ্গীতে দেশ-বিদেশের সুরের ধারা, রবীন্দ্রসঙ্গীতে তানের স্থান, রাবীন্দ্রী-ভৈরবী, রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুরের ছন্দ, রবীন্দ্রনাথের গান ও বাঙলার লোকসঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথের ঋতু-সংগীত—এই প্রবন্ধ কয়টি।

গ্রন্থের প্রথমে লেখকের 'কৈফিয়ত' অংশটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। 'কৈফিয়ত' থেকে জানা যায় যে বৈতানিক সঙ্গীত সংস্থায় অনুষ্ঠিত নানা আসরে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে লেখকের ভাষণগুলির সংকলিত রূপ 'রবীন্দ্রনাথের গান' নামে পরবর্তীকালে গ্রন্থরূপ লাভ করেছে। অবশ্য প্রকাশকের কথা থেকে জানা যায় এই গ্রন্থটির সংস্করণ

থেকে সংস্করণে প্রবন্ধগুলির আংশিক পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়েছে, আর 'সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি কলকাতা পৌরসভার রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী গ্রন্থ থেকে সংকলিত। এই গ্রন্থের প্রবন্ধটিগুলির উপজীব্য বিষয় রবীন্দ্রনাথের গানের সুরধারা। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠাকুরপরিবারের একজন উত্তরপুরুষ এবং 'বৈতানিক' নামক সঙ্গীত সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা। সৌম্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথের ভ্রাতা। তাঁর 'কৈফিয়ত'-এর লেখনী থেকে জানা যায় যে, তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের কাছে সঙ্গীতশিক্ষা করেছেন। সৌম্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রসান্নিধ্যধন্য রবীন্দ্রসঙ্গীতানুরাগী গায়ক ও লেখক। তিনি যখন রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে মতামত ব্যক্ত করেন, তখন তা স্বতন্ত্র মর্যাদার দাবী রাখে। গ্রন্থের 'কৈফিয়ত' অংশে উদাহরণ সহযোগে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরবিকৃতি নিয়ে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

> ''রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-ভোর সুরসৃষ্টির ক্ষেত্রে এই পঞ্চমকেই বহাল রেখেছেন। রাগের কাঠামোর শুদ্ধতার ও বিশুদ্ধতার বিচার নিয়ে তিনি আদপেই ব্যস্ত হননি। যেটি বলতে চেয়েছেন সেটি ঠিকভাবে বলা হল কিনা, তার ভাবটিকে যতদূর সম্ভব প্রকাশ করা গেল কি গেল না, একমাত্র এইটেই ছিল তাঁর দেখবার ও ভাববার বিষয়। আজ তাই রাগসঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত তাঁর গানগুলিকে নিয়ে যখন রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট অভিমত বিরুদ্ধ প্রণালীতে বিকৃত করবার অভিযান চলেছে, আর বিশ্বভারতী এই গানগুলির বিকৃতকৃত সুরের স্বরলিপি প্রকাশ করছেন, আবার এটাও লিখে দিচ্ছেন যে আগেকার সুরটাও চলবে অর্থাৎ

রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সুর চলবে আবার ওস্তাদের দ্বারা অধুনা বিকৃতসুরও চলবে, তখন অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে এই কথাটা বলতেই হবে যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কল্যাণ তো করছেনই না, বরঞ্চ তার অপূরণীয় ক্ষতি করছেন।"[২]

মুদ্রিত স্বরলিপির ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারীতায় সম্ভবত প্রথম তিনিই তীব্র সমালোচনার সূচনা করেন। কবিকণ্ঠে বা অগ্রজ দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠে যে সুর তিনি শুনেছিলেন, তার সামান্যতম বিকৃতিতেও স্বভাবতই তিনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। এই গ্রন্থে 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্রমবিকাশ' প্রবন্ধটি একটি অনন্য সংযোজন। এখানে তিনি কোন কাল্পনিক যুগবিভাগ করেননি। কী ধারায় ক্রমে ক্রমে রবীন্দ্রনাথের গানে সৃষ্টির বৈচিত্র্য ঘটেছে, তার সহজ বিশ্বাসযোগ্য আলোচনা আছে। সাল বা তারিখের কোন সীমায় তিনি ক্রমবিকাশকে বাঁধেননি। লেখকের মতে, ভারতীয় রাগসঙ্গীতের ঐতিহ্যে আছে রাগমিশ্রণ এবং রবীন্দ্রনাথ সুরারোপে কিছুটা প্রাচীন সুরস্রষ্টাদের অনুসরণ করেছেন। ভারতীয় রাগরাগিনীর মধ্যে ভৈরবী রাগিনীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ দুর্বলতা বা ভালো লাগা ছিল, যা লেখক 'রাবীন্দ্রী-ভৈরবী' নামে আখ্যা দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আলোচনায় গবেষক সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য,

''রবীন্দ্রনাথ যখন 'রাবীন্দ্রী-ভৈরবী' সৃষ্টি করলেন তখন নতুন একটি সুর সৃষ্টি করতে হবে এই সিদ্ধান্ত করে সুর-সৃষ্টির কাজে হাত দেননি। প্রকৃত সৃষ্টি এমন সচেতনভাবে, নক্শা তৈরি করে করা যায় না। সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় মানুষের সত্তার অবচেতন অংশের অবদান খুবই বেশি। রবীন্দ্রনাথের সুরমিশ্রণ যেমন ভাবধর্মী, রাগধর্মী নয়, 'রাবীন্দ্রী ভৈরবী'ও

তেমনি ভাবপ্রকাশের তাগিদে সৃষ্টি হয়েছে। তিনি ভেবেচিন্তে রাগগুলিকে মেশান নি কখনো, গানের কথার ভাবটিকে রূপ দেওয়ার জন্যে সুর উৎসারিত হয়েছে স্রষ্টার অন্তর থেকে। তারপরে সেই গানটির সুরের দেহ কত রাগের বিনুনি সেটি ধরা পড়ল বিশ্লেষণ বাগীশদের কাছে।”[৩]

ঋতুসঙ্গীতের আলোচনায় সমালোচক বলেছেন-গ্রীষ্ম দুপুরের বিষাদমাখা ছবি আঁকতে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন বর্ষার মূলতানী, বেদনার আমেজ-ভরা টোড়ী আর ভীমপলশ্রী (প্রখর তপন তাপে)। বর্ষার গানে বর্ষার প্রচলিত রাগ ছাড়াও সাহানা, ইমন, পিলু, সিন্ধু, হাম্বির, দেশ, পঞ্চম প্রভৃতি প্রচলিত রাগ ব্যবহৃত হয়েছে। শরতের গানে দেখা যায় বসন্ত বা গ্রীষ্ম ঋতুর সুর। লেখকের মতে এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ গানের ভাব অনুযায়ী রাগমিশ্রণ ঘটিয়েছেন।

‘রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুরের ছন্দ’ প্রবন্ধে আলোচক বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে বৈচিত্র্য আনবার জন্য একদিকে যেমন কথার ভাবের সঙ্গে ছন্দের ভাব মিলিয়েছেন, অপরদিকে তেমনি কথার ধ্বনি বৈচিত্র্যের সঙ্গে ছন্দের বৈচিত্র্য এনেছেন। বেশ কিছু গানের উল্লেখসহ তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের বিভিন্ন অংশে ঝোঁক দিয়ে ছন্দ, কথার বিরাম, মাত্রার বিন্যাস এবং বিভিন্ন তালের ছন্দ বিন্যাসের মধ্যে বৈচিত্র্য এনেছেন। ‘মধু গন্ধে ভরা’, ‘ওগো কিশোর আজি’, ‘নৃত্যের তালে তালে’ এবং ‘হে নিরুপমা’ গানগুলির কথার ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একই গানে বিভিন্ন তাল ব্যবহৃত হয়েছে। লেখক গ্রন্থের প্রতিটি রচনার মধ্যেই ভারতীয় সঙ্গীতের অনুসারী সংস্কারমুক্ত অসাধারণ গীতিকার, সুরকার ও ছান্দসিক রবীন্দ্রনাথকে প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। প্রতিটি রচনার মধ্যেই অনুরণিত হয়েছে ভারতবর্ষের প্রাচীন সুর, প্রচলিত রাগরাগিনী এবং প্রাচীন ভারতের

সুর-সংস্কৃতির নিজস্বতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গানের আত্মিক যোগসূত্র। সমালোচকের মতে, পরিবর্তনের স্রোতে রবীন্দ্রনাথের বাঁধন ভাঙার সাধন বিশেষ করে নতুন সুরসৃষ্টির ক্ষেত্রে কখনই ভারতীয় রাগরাগিনী ধারার সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করেনি। রবীন্দ্রসৃজন প্রতিভার আলোয় আলোকিত এমন একজন বরেণ্য লেখকের গ্রন্থ নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রসঙ্গীত আলোচনার সরণীতে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যা রবীন্দ্রসঙ্গীত পিপাসুদের কাছে চিরাদৃত।

।। **দুই** ।।

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের নানাদিক' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে রবীন্দ্র স্নেহধণ্যা ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণীর স্মরণে। গ্রন্থের বিষয়সূচিতে রয়েছে—(১) রবীন্দ্রসঙ্গীতের রহস্যলোকে, (২) রবীন্দ্র-নাটকে নৃত্য ও গীত, (৩) রবীন্দ্রনাথের সম্মেলক সংগীত, (৪) রবীন্দ্রনাথের আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত, (৫) রবীন্দ্রনাথের গদ্যগান, (৬) রবীন্দ্রসঙ্গীতে রুচির প্রসঙ্গ, (৭) রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশ ও সাম্প্রতিক বাংলা গান— এই কয়টি প্রবন্ধ। গ্রন্থের প্রথমে রয়েছে শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষ লিখিত একটি ছোট ভূমিকা, যা গ্রন্থটিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। শান্তিদেব ঘোষ এই আলোচক দম্পতিকে যথাযথ সাধুবাদ জানিয়েছেন তাঁদের গ্রন্থে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর অবতারণায়। আমাদের সংগৃহীত আলোচ্য গ্রন্থটি প্রথম সংস্করণ। গ্রন্থে 'অবতরনিকা' অংশে কয়েকটি অত্যন্ত সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ কথা লিখেছেন লেখকদ্বয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতে কথা ও সুরের সমান গুরুত্ব রয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতে কাব্য কখনও কখনও সুরের আশ্রয় ছাড়াই একটা স্থায়ী উপলব্ধির রেশ রেখে যায়। অথচ রবীন্দ্রসঙ্গীতকে জনগণের কাছে পৌঁছে

দেবার জন্য শিল্পীরা নানা ধরনের কায়দা বা ভঙ্গীর সাহায্য নিয়ে থাকেন। আবার অনুবাদ করেও রবীন্দ্রনাথের গান জনতার দরবারে পৌঁছে দেবার চেষ্টা হয়। যদিও অনুবাদে মূল কাব্যের ভাবসম্পদ যথাযথ রক্ষা করা যায় না। ফলে অনুবাদগীতিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল রঙ অনেকটাই ফিকে হয়ে যায়, যতই অনুবাদ গীতিটি রবীন্দ্রসুরে গাওয়া হোক। অর্ধশতাব্দী পূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থে লেখকদের এই ভাবনা আজকের দিনেও কিন্তু সমান প্রাসঙ্গিক। এখানে তাঁরা সমাধান সূত্র হিসেবে বলেছেন যে, অনুবাদ করতে হলে শুধু গানের ভাবটুকু অন্য ভাষায় বলে দিয়ে গানটি মূলভাষায় পরিবেশন করা উচিত। এতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মহিমা বজায় থাকবে। তাঁরা এও বলেছেন,

> 'হিন্দী গান যেমন সকলেই শেখেন, তেমনি ভারতবর্ষের এক প্রদেশের গান অন্য প্রদেশের ভাষা-ভাষীর পক্ষে শিখে নেওয়া এমন কী কঠিন!'[৪]

রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশেষ ঢং বা ধরণ বা চাল রয়েছে। শিল্পীর ব্যক্তিগত ভঙ্গী তো থাকবে, তবুও রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশেষ ধরণকে অস্বীকার করা যায় না। সে ধরণটি আলোচনায় বুঝে ওঠা সম্ভব নয়, এ এক অব্যক্ত মাধুরী। লেখকদ্বয় খুব সুন্দর করে বলেছেন,

> 'চাঁদের চারপাশে যে একটি আভা থাকে, কোন বিশেষ উক্তিকে ঘিরে যেমন একটা অব্যক্ত বোধিসঞ্জাত অর্থ থাকে, এও ঠিক তেমনি। রবীন্দ্র গীতরুচি। চর্চার ফলে এর উপলব্ধি হয়, কান থেকে সোজা হৃদয়ে এর অভ্যুদয়। উচ্চারণ থেকে শুরু করে কণ্ঠক্ষেপ পর্যন্ত রীতি-বৈশিষ্ট্যের ফলে এর প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত।'[৫]

রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী, ঢং নিয়ে যারা স্বেচ্ছাচারী তাদের এই উক্তিটির তাৎপর্য বুঝে নিয়ে তবেই গান গাওয়া উচিত বলে মনে হয়। আজকের দিনে এটি আরও প্রাসঙ্গিক, স্বত্ব বিলোপোবর্তী এই ঢালাও রবীন্দ্রচর্চার দিনে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের রহস্যালোকে প্রবেশ করে লেখকদ্বয় দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ কীভাবে বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবকে এক অখণ্ড সত্তার মধ্যে দেখেছেন অতীন্দ্রিয় বা মিষ্টিক দৃষ্টির মাধ্যমে। এই অতীন্দ্রিয় গানের কথা, ভাব, সুর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বেজে উঠেছে চিরব্যাপ্ত, চিরজাগ্রত যিনি তাঁকে ঘিরেই।

রবীন্দ্রনাটকে নৃত্য ও গীতের প্রয়োগে লেখকদ্বয়ের ভাবনা হল যে লিখিত বাণীকে রূপ দিতে গিয়ে নানা ঝোঁক বা ভঙ্গী যখন হার মানে তখন সেই গভীর অনুভূতি প্রকাশিত হয় গানে, আর যখন গানও ভাব প্রকাশে হার মানে, তখন নানা অঙ্গভঙ্গি মুখের চোখের ভাষা কাজে লাগে। আর এই ইঙ্গিতময় রূপটি প্রকাশিত হয় নৃত্যে। রবীন্দ্রনাথও এই ধারা অবলম্বন করেছেন নাটকের নৃত্য ও গীত সংযোজনে। অবশ্য শিল্পীকে গান বা নাচে সুযোগ দিয়ে নৈপুন্য দেখাবার জন্য আবার কখনও কখনও নাটকে একঘেয়েমি কাটানোর জন্যও রবীন্দ্রনাটকে গান আর নাচের অবতারণা হয়েছে বলে লেখকদ্বয় মনে করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের যুরোপীয় সংগীতের আদলে সৃষ্ট সম্মেলক বা কোরাস ব্যবহার সম্বন্ধে লেখকদের মতামত হল বেদগান থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধারার লোকসংগীতের মধ্যে কোরাস বা সমবেত সংগীতের যে প্রচলন ছিল, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই বৈশিষ্ট্যের অনুকরণে সুরের মিশ্রনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যেখানে যতটুকু অংশ সমবেতভাবে গাইলে পরিবেশনের মাধুর্য বাড়ে সেভাবেই গানকে সাজিয়েছেন। একই গানের মধ্যে সুরের মাধুর্য এবং কথার ভাবার্থ অনুযায়ী গানের কোন অংশ একক, কোন অংশ দ্বৈত, আবার কোন অংশ বহুজন

মিলে গাওয়ার পদ্ধতি তৈরি করেছেন।

'আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত' প্রবন্ধে নানা উপলক্ষে রচিত রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছেন লেখকদ্বয়। অবশ্য এ বিষয়টি সম্পর্কে রবীন্দ্রসঙ্গীত আলোচনার আদিপর্বে শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' গ্রন্থে আমাদের পরিচিতি ঘটেছে এর পূর্বেই। তবুও তাঁদের লেখনীতে বিষয়টি অল্প হলেও স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে। গদ্যগান প্রবন্ধে লেখকদ্বয় খুব ধারাবাহিকতার সঙ্গে দেখিয়েছেন পদ্যগান থেকে কীভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত গদ্যগানে পৌঁছল, আর এও যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের মুক্তির এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

এই গ্রন্থ পর্যালোচনায় বিশেষ স্থানে রয়েছে 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে রুচির প্রসঙ্গ' এবং 'রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশ ও সাম্প্রতিক বাংলাগান' এই প্রবন্ধগুলো। লেখকদ্বয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের রুচি ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে বলেছেন—

> ''রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করতে গিয়ে রাবীন্দ্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করাতেই সার্থকতা। আন্তর অনুভূতি দিয়ে এবং নিয়মিত চর্চা করে নিজেকে রাবীন্দ্রিক পরিবেশভুক্ত এবং রাবীন্দ্রিক রুচির সঙ্গে একাত্ম করে নিতে হয়।... রাবীন্দ্রিক রুচি গঠনের জন্য আমাদের যেমন রবীন্দ্র-সাহিত্যের ব্যাপক অনুশীলন দরকার, তেমনি দরকার দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সামাজিক পরিবেশ-এ দু'য়ের অনুশীলন। রবীন্দ্রসঙ্গীত তথা রবীন্দ্ররুচির মূল আধার ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় জীবনদর্শন। রাগ-রাগিনীর মধ্য দিয়ে আমাদের বিশ্বপ্রকৃতির এবং বিশ্বানুভূতির যেমন প্রকাশ, তেমনি কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ ভাবরূপের এবং

রসরূপের। .... রবীন্দ্রসঙ্গীতের গীতাংশ আয়ত্ত করবার পরও গীতরুচির পরিপূর্ণ বিকাশ অনুশীলন নির্ভর। ... তাই কেবলমাত্র গান গাইতে শেখাটাই শেষ কথা নয়, গানকে কেন্দ্র করে গানের ভাবরূপ বা সাহিত্যরূপ উপলব্ধি করতে হবে। সাহিত্য যেমন সমগ্র জীবনের আলেখ্য, সঙ্গীতও তেমনি জীবনেরই প্রতিফলন। রবীন্দ্রসংগীতজ্ঞ রসিকের কাছে আমরা জীবনের উপলব্ধি-সঞ্জাত এই বিশিষ্ট রুচির দাবি করতে পারি।"[৬]

সত্যিই তো জীবনের চর্চা আর বোধের সাথে যুক্ত হলেই তো রবীন্দ্রগানের উপস্থাপন যথার্থে জীবনগানে পরিণত হয়। যৌথ লেখনীতে গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন দুজনে।

সুবিনয় রায়-এর 'রবীন্দ্রসঙ্গীত সাধনা' গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালের আগস্ট মাসে। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থটি তৃতীয়সংস্করণ ১৯৭৮ সালের। গ্রন্থের বিষয়সূচিতে রয়েছে—প্রস্তাবনা— প্রাথমিক সংগীতচর্চা, রবীন্দ্রসঙ্গীতের জন্য বিশেষ চর্চা।

প্রথম অধ্যায় ঃ প্রাথমিক সঙ্গীত সাধনা, তানপুরা ব্যবহার, কণ্ঠস্বর সাধনা প্রাথমিক আলোচনা ও ব্যায়ামাদি (ক) নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম (খ) কণ্ঠস্বরকে অনুনাদ সমৃদ্ধ করার পদ্ধতি, সরগম সাধনা, অলংকার সাধনা, কণ্ঠস্বরের বলসাধন ও বলনিয়ন্ত্রণ, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের দশটি ঠাট, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে প্রচলিত তাল, তালের লয়, রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নতুন তাল।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ রবীন্দ্রসংগীতের গায়কী (এক)—গোড়ার কথা, কণ্ঠস্বর, অলংকার, শ্রুতি, উচ্চারণ, শ্বাস নিয়ন্ত্রণ, রবীন্দ্রসাহিত্য। রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী

(দুই)—সাংগীতিক পর্যায় বা ধারা, হিন্দী ভাঙা গান, ঢালা গান, ভানুসিংহের পদাবলী।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ যন্ত্রসঙ্গীত সহযোগিতা—সুরযন্ত্র, তালযন্ত্র।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি, আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির প্রচলিত নিয়মাবলী ও সাংকেতিক চিহ্নসমূহের ব্যাখ্যা, ব্যবহারিক দিক।

পরিশিষ্ট।

গ্রন্থভুক্ত বিষয়গুলিকে বরেণ্যগায়ক ও গবেষক চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। প্রাথমিক সঙ্গীত সাধনা, রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী, যন্ত্রসঙ্গীত সহযোগিতা এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি এই চারটি অধ্যায়ের আলোচনার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার্থীদের সাবলীল ভাষায় প্রত্যেকটি বিষয়ে সচেতন করেছেন এই রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষক। গায়ক তথা শিক্ষকের রচনার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই স্থান পেয়েছে তানপুরার ব্যবহার, কণ্ঠস্বর সাধনা, সরগম সাধনা, অলংকার সাধনা, কণ্ঠস্বরের বলসাধন ও বলনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়।

গায়কী সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য—

> ‘‘রবীন্দ্রসঙ্গীতের সাধনায় সাধারণ শিক্ষাদীক্ষা, মার্জিত রুচি, রবীন্দ্রনাথের গল্প, প্রবন্ধ, কাব্য নাট্য, চিত্র প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় এবং তাঁর জীবন দর্শন সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা ও অনুভূতি অপরিহার্য।’’[৭]

তিনি আরোও বলেন, কণ্ঠস্বর, অলংকার, শ্রুতি, ভাব, উচ্চারণ, শ্বাসনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদিও গায়কী ফুটিয়ে তুলতে সহায়ক। আসলে নিখুঁত সুরে তালে উচ্চারণ আর সাথে সঠিক রবীন্দ্র মননের সামঞ্জস্যই তো গায়কীর মাধ্যমে ফুটে ওঠে, লেখক যথার্থ অর্থে এ দিকটাই তুলে ধরেছেন।

তাল বিষয়ক যে আলোচনা এই গ্রন্থে রয়েছে তা নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ পাওয়া। হিন্দুস্থানী তালের আলোচনার পাশাপাশি রবীন্দ্রসৃষ্ট বা রবীন্দ্রসঙ্গীতে ব্যবহৃত তাল নিয়ে লেখকের অভিমত আমাদের ঋদ্ধ করে। গ্রন্থকার প্রদত্ত কিছু তালের বোল বা বাণী এই আলোচনাকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চায় তাল বিষয়ক এই অধ্যায়টি অবশ্যপাঠ্য ও গ্রহণীয়।

রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চায় একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে পরবর্তী পর্যন্ত এই গ্রন্থে আলোচিত সব কয়টি অধ্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ। ভানুসিংহের পদাবলীর গান গাইতে গিয়ে বিশেষ করে উচ্চারণের দিক থেকে যে সমস্যা দেখা দেয় তারও সমাধান দিয়েছেন গ্রন্থকার ব্রজবুলি আর সংস্কৃতের উচ্চারণের সহজ তফাত নির্দেশ করে। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গেলে কণ্ঠস্বরের প্রস্তুতি নিয়ে নানাভাবে আলোচনা করেছেন গ্রন্থকার—অনুনাদ সমৃদ্ধ কণ্ঠ কীভাবে তৈরি করতে হবে, কণ্ঠবল নিয়ন্ত্রণ কীভাবে করতে হবে, উচ্চারণ, শ্বাসনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে সাবলীল লেখনীর মাধ্যমে। তবে শুধু টেক্‌নিক্ বা ধরণধারণ আয়ত্তেই যে পরিবেশনা সার্থক সুন্দর হবে তা নয়, পরিশিষ্টে সমালোচক খুব সুন্দর বলেছেন—

> ‘‘উপনিষদের যুগে শিক্ষায় যেমন শ্রবণ, মনন ও ধ্যান—এই তিনটি স্তর ছিল, রবীন্দ্রসঙ্গীতেও টেক্‌নিক্ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় উক্ত তিনটি শিক্ষাস্তর বা প্রক্রিয়া অনুসরণ করা চাই, তবেই শিক্ষা ও সাধনা সার্থক হবে।’’[৮]

গ্রন্থটির নাম ‘রবীন্দ্রসঙ্গীত সাধনা’, যথার্থ অর্থেই এই গ্রন্থ রবীন্দ্রসঙ্গীত সাধনার পথে সঠিক দিক নির্দেশ করে।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে প্রথম প্রকাশিত হয় প্রফুল্লকুমার দাসের ‘রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গ দ্বিতীয় খণ্ড’ গ্রন্থটি। সংগৃহীত আলোচ্য গ্রন্থটি ২০০৭ সালের

নভেম্বরে পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ। গ্রন্থটির সূচিপত্রের বিষয়— সূচনা, রবীন্দ্রসঙ্গীতের তত্ত্ব, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সূচনাপর্ব ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রসঙ্গীতে ধ্রুপদের প্রভাব, খেয়ালাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীত, টপ্পা অঙ্গের রবীন্দ্রসঙ্গীত, ঠুংরী অঙ্গের রবীন্দ্রসঙ্গীত, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, কীর্তনাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীত, বাউল সুরের রবীন্দ্রসঙ্গীত, অন্যান্যশ্রেণির রবীন্দ্রসঙ্গীত, আনুষ্ঠানিক রবীন্দ্রসঙ্গীত, স্বদেশী রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল্যায়ন, ভাষা ও সুর, গীতাঞ্জলির গান, নাটক, গীতিনাট্য—'বাল্মীকি প্রতিভা', 'কালমৃগয়া', 'মায়ার খেলা', নাট্যের মালা ও গানের মালা, নৃত্যনাট্য—'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা', 'শ্যামা', 'মায়ার খেলা', গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের বৈশিষ্ট্য, সঙ্গীত চিন্তায় প্রাচীন ভারত ও রবীন্দ্রনাথ, মন্ত্রে সুরযোজনা, রবীন্দ্রসঙ্গীতের রস-বিশ্লেষণ, সঙ্গীতিলিপি ও সুররক্ষণ, রাগসঙ্গীত—বিভাস, দেশকার, গুণকেলী, দেওগিরি। গুর্জরী টৌড়ী, গান্ধারী, খট্, গৌড়সারং, বড়হংসারং, সুহাকানাড়া। গৌরী, ললিতা-গৌরী, মারবা, সিন্ধুড়া, দীপক। ইমনকল্যাণ, কামোদ, শ্যাম, নটমল্লার, গৌড়মল্লার। বেহাগড়া, ঝিঁঝিট, সিন্ধু, শংকরা, সুরট, মেঘ, নায়কীকানাড়া। সোহিনী, সাহানা। কালাংড়া। রবীন্দ্রসঙ্গীতে রাগ, নির্ঘণ্ঠ।

২২৩ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটিকে আলোচক উৎসর্গ করেছেন—'আদর্শবাদী রবীন্দ্রসঙ্গীত-অনুশীলনকারীদের উদ্দেশ্যে।' তাঁর মতে 'রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গ প্রথম খণ্ডে'র পরিপূরক গ্রন্থ হিসেবে 'দ্বিতীয় খণ্ড' অর্থাৎ আলোচ্য গ্রন্থটির পরিকল্পনা এবং প্রথম খণ্ডের আটটি পাঠ্যক্রমের শেষে রবীন্দ্রসঙ্গীত-অনুশীলনকারীদের মনে নানা প্রশ্ন ও কৌতূহলের প্রতি লক্ষ রেখে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর অবতারণা। আলোচ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সূচনা পর্ব ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রসঙ্গীতে ধ্রুপদের প্রভাব, গীতাঞ্জলির গান বিষয়গুলি পূর্বে প্রবন্ধাকারে ও কিছু কিছু পাঠান্তরে অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটিতে রাগসঙ্গীতের ধারায় রচিত রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদাঙ্গ, খেয়ালাঙ্গ, টপ্পাঙ্গ এবং লোকসঙ্গীতের ধারায় রচিত কীর্তনাঙ্গ, বাউলাঙ্গ ইত্যাদি গান

সম্পর্কে অবহিত করে লেখক প্রতিটি অঙ্গের গানের তালিকা সংযোজন করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিভিন্ন অঙ্গের গান সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দিয়েছেন। এছাড়া, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, আনুষ্ঠানিক স্বদেশী, গীতাঞ্জলির গান, নাটক, গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য ইত্যাদি প্রত্যেকটি অধ্যায়ে গানের তালিকা ও রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি পর্যায়ের গান রচনার বৈশিষ্ট্য এবং প্রত্যেকটি পর্যায়ের গানের সঙ্গে স্বরবিতান সংখ্যা উল্লেখ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুশীলনকারীদের সাহায্য করেছেন। 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের সূচনা-পর্ব ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' নিবন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বরলিপি গীতিমালায়' জ্যোতিরিন্দ্র নাথের সঙ্গীতের তালিকা, রবীন্দ্রনাথের সুর ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুরযোজনার তালিকা এবং রবীন্দ্রনাথের কথা ও সুরের তালিকা সংযোজন করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গান ও রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে রবীন্দ্রানুরাগীদের ধারণা স্বচ্ছ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কথা ও সুরে 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' এর বাইরেও কিছু কিছু গান যে জ্যোতিদাদার পরশে 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' হয়েছে, তা আমাদের জানা থাকা দরকার। রবীন্দ্রসঙ্গীতে ব্যবহৃত বিশেষ কিছু রাগের পরিচয়ও লেখক এই গ্রন্থ মধ্যে তুলে ধরেছেন।

গীতাঞ্জলির গান নিয়ে রবীন্দ্রনাথের গানের সমালোচনার আদিপর্বে শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষ আলোচনা করেছেন, কিন্তু প্রফুল্লকুমার দাস তাঁর 'গীতাঞ্জলির গান' প্রবন্ধে বিষয়টিকে অন্যভাবে বিশদে আলোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্যের পুনরুল্লেখ করে বলা যায় যে গীতাঞ্জলির মোট ১৫৭টি কবিতার মধ্যে সুরারোপ করা হয়েছে ৮৬টি কবিতার। লেখকের মতে রবীন্দ্রনাথের সুর যোজনার সমগ্র ধারাকে তিনটি স্তরে অর্থাৎ প্রথম, মধ্য ও শেষ এইভাবে ভাগ করা যায়। আর এই তিনটি স্তরের মধ্যে মধ্যস্তরে রয়েছে গীতাঞ্জলির গানগুলি। সমালোচক প্রফুল্লকুমার দাস বলেন,

''রবীন্দ্রসঙ্গীতে গীতাঞ্জলির গান-রচনার যুগকে একটি

বিশেষ সন্ধি-যুগ বললে অত্যুক্তি হয় না। ... গীতাঞ্জলির গানগুলির সুর গঠনের দিক গভীরভাবে অনুশীলন করলে বোঝা যায়, এই সব গানের সুর রাগভিত্তিক হলেও কবির মৌলিকতার গুণে বাণী ও সুরের মিলিত 'অর্ধনারীশ্বর' রূপে প্রকাশমান।"[৯]

'গীতাঞ্জলি'র গানগুলিতে রাগের সুর নিয়েও তিনি পরিচ্ছন্ন মতামত রেখেছেন। লেখকের মতে গানগুলিতে ভৈরবী-সুরেরই প্রাধান্য, যদিও সংখ্যা বিবেচনায় ভৈরবীর পরেই রয়েছে কল্যাণ, খাম্বাজ আর মল্লার শ্রেণির রাগ। গীতাঞ্জলির গানে তাল প্রয়োগ নিয়েও তাঁর সুচিন্তিত মতামত রয়েছে। গীতাঞ্জলির গানে তথাকথিত ভারী তাল ব্যবহার প্রায় হয়নি বললেই চলে, ২/৪টি গানে ব্যতিক্রম দেখা যায়। গীতাঞ্জলির গানে রবীন্দ্রনাথের তাল-ছন্দ নিয়ে কিছু পরীক্ষার নিদর্শনও দেখিয়েছেন গ্রন্থকার। লেখকের মতে,

"গীতাঞ্জলির গানে... একদিকে রবীন্দ্রনাথ সাবলীলগতির ছন্দগুলি যেমন গ্রহণ করেছিলেন, অন্য দিকে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ছন্দকে কাব্যসুরগত মিলিত ভাবপ্রকাশের খাতিরে প্রবর্তিত করেছেন। ... অসমপদী ছন্দে সাধারণত কিছুটা উল্লম্ফনের ভাব থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি অসমপদী তালের গানের ক্ষেত্রে উক্ত ভাবটি গুপ্তভাবে বিরাজ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে 'ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা' গানটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গানটির লয় ও পরিবেশন এরূপ হওয়া উচিত যাতে ঝম্পক তালের অসম ছন্দটি গুপ্তভাবে নিহিত থাকে। তা না হলে গানের গীতিরূপ ও ভাবরূপ খর্ব হওয়ার আশঙ্কা থাকে।"[১০]

লেখক যে গানের উদাহরণ দিয়ে বললেন ঝম্পকের অসম ছন্দে সমঝে না চললে গানের ভাব ক্ষুণ্ণ হবে, তা সঠিক। তাই তো এই গানটি পরিবেশনে এখন আলাপরীতির ঢালাভাবের ঢংটিই প্রচলিত। আসলে গানের ভাবের খাতিরেই মনে হয় গানটিকে তালের হিসেব থেকে বের করে নিয়ে চালাভাবে গাওয়া হয়। গীতাঞ্জলির এমনি আরও একটি গান যেমন—'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' এই গানটিকেও ভাবরক্ষার খাতিরে ঝম্পকের হিসেব থেকে মুক্ত করে ঢালাভাবে গাইলেই ভাল লাগে। রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ প্রফুল্লকুমার দাস রবীন্দ্রভাবাদর্শের একজন শিক্ষক তথা রবীন্দ্রগানের অন্যতম স্বরলিপিকার। তিনি শিক্ষক জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুশীলনকারীদের মনের নানা প্রশ্ন আর কৌতূহল মিটিয়েছেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। গ্রন্থটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চায় অবশ্য পাঠ্য আর সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতির দাবী রাখে।

।। তিন।।

জয়দেব রায়ের 'রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিমণ্ডল' গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে। সংগৃহীত আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়সূচিতে রয়েছে—ব্রহ্মসঙ্গীত, সুরগুরু যদুভট্ট, রাধিকাপ্রসাদ, সৌরীন্দ্রমোহন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কাদম্বরী দেবী, অক্ষয় চন্দ্র চৌধুরী, অভিজ্ঞা দেবী ও প্রতিভা দেবী, সরলা দেবী, ইন্দিরা দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী, সুরেন্দ্র নাথ, প্রমোদকুমার ও গুরুদাস, ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ, বিদেশী সুরসাধক আর্নল্ড বাকে, শ্রোতা ও গায়ক রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রসংগীত চর্চা। লেখকের নিবেদন থেকে জানা যায় আলোচ্য গ্রন্থটি লেখকের ক্রমিক সাংগীতিক আলোচনার শেষ পর্ব।

গ্রন্থে উল্লিখিত ব্যক্তিত্বদের অবতারনায় মূলত উপস্থাপিত হয়েছে রবীন্দ্রগানের রচনা, প্রচার ও প্রসারে এই সমস্ত ব্যক্তিত্বদের কার কতটা অবদান রয়েছে। যাঁদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন সে সমস্ত ব্যক্তিত্বদের জীবনালোকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অবস্থান নিরূপণ করতে গিয়ে লেখকের মন্তব্য হল—

> ''বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তীর পর ব্রাহ্মসমাজের গায়ক নির্বাচিত হইলেন যদুনাথ ভট্ট। ব্রহ্মসঙ্গীত রচনায় এবার একটি নতুন ঢঙ্ আসিয়া পড়িল। তাঁহার কাছে হিন্দু গান শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভ্রাতারা ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিতেন হুবহু সেই সকল সুরে... যদু ভট্টকে কেন্দ্র করিয়াই রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিমণ্ডলী রচিত হইয়াছিল। ...শেষপর্যন্ত ঐ সুর (রুমঝুম্ বরখে আজু বাদরবা) রবীন্দ্রনাথের হাতে আসিয়া সুরফাঁক্তাতালে রূপ লাভ করিল ''শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ''।[১১]

লেখকের কথা থেকে জানা যায় যে রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী রবীন্দ্রগানের প্রথম যুগে হিন্দী উচ্চাঙ্গ গানের সুরে গ্রথিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড করেছিলেন। লেখকের বর্ণনায় উঠে আসে সর্বাগ্রগণ্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অবদানের প্রসঙ্গ। লেখক বলেন,

> ''রবীন্দ্রসঙ্গীতের উৎসমুখে ও ক্রমবিকাশে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান সর্বাপেক্ষা অধিক।...কেবল সঙ্গীত রচনা, সুর সৃষ্টি নয়, অভিনয় নাট্যরচনা ও প্রযোজনা সর্বক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সত্যই অগ্রজ, তাঁহারই নির্দেশ

ও প্রেরণা অনুসারে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার উন্মেষ হয়।”[১২]

আবার অভিজ্ঞা দেবী, প্রতিভাদেবী, সরলাদেবী, ইন্দিরাদেবী, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্র নাথ, বিদেশী সুরসাধক আর্নল্ড বাকের মতো ব্যক্তিত্ব যাঁরা রবীন্দ্রনাথের গানকে স্বরলিপি, রেকর্ড ও প্রচারের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন—এই সমস্ত সঙ্গীত ব্যক্তিত্বের জীবনচর্চার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের অকথিত কাহিনি এই গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। লেখকের অনুসন্ধানে পাওয়া যায় যে অভিজ্ঞাদেবী কবির প্রথম জীবনের সর্বাপেক্ষা অনুরাগিনী ও প্রিয়তমা ছাত্রী ছিলেন। নিজের গান প্রচারের জন্য কবি অভিজ্ঞাকেই সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন, তাঁর কণ্ঠেই কবির গান প্রথম শোনা যেত। অভিজ্ঞাদেবীর বড় বোন প্রতিভাদেবীও কবির সঙ্গীতশিষ্যা ছিলেন। আর সরলাদেবী মাদ্রাজ, মহীশূর, পাঞ্জাব যেখানেই যেতেন সেখান থেকে নতুন নতুন সুর আহরণ করে এনে কবিকে শোনাতেন। বিলাতী গান ভাঙা, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ডালি যে পূর্ণ হয়েছে তাতে সরলাদেবীর সাথে ইন্দিরাদেবীরও অবদান রয়েছে এ কথা ধরা দেয় লেখকের লেখনীতে। দিনেন্দ্রনাথের অবদানের প্রসঙ্গে লেখক বলেন,

‘‘দিনেন্দ্রনাথ কিন্তু রবীন্দ্রপথানুসারী সঙ্গীতেই নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কবি দিনেন্দ্রনাথকে তাঁহার ‘সকল গানের ভাণ্ডারী’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সংরক্ষণ ও প্রচারের গুরুতর দায়িত্ব ছিল তাঁহার উপরই ন্যস্ত, এই দায়িত্ব তিনি সারাজীবন নিষ্ঠাভরে পালন করিয়া গিয়াছেন।”[১৩]

আর্নল্ড বাকে সাহেব চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন রবীন্দ্রগানকে বিলাতী রীতিতে

স্বরলিপিবদ্ধ করে এ তথ্যও লেখকের লেখনীতে ধরা দেয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিকাশ ও প্রচারের বিষয়ে পরিমণ্ডলটি রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বসহ মূলত অন্য যে সব ব্যক্তিত্বের দ্বারা রচিত হয়েছে এই গ্রন্থে সে সবেরই সন্ধান মেলে।

।। চার।।

অরুণ ভট্টাচার্য-র সম্পাদনায় 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের নানাদিক' গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে। গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সূচি যথাক্রমে—ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী ঙ্ম চিঠিপত্র, শৈলজারঞ্জন মুজমদার ঙ্ম রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষাপ্রসঙ্গ, অরুণ ভট্টাচার্য ঙ্ম রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্বরসঙ্গতি ও সুরবৈচিত্র্য, প্রফুল্লকুমার দাস ঙ্ম রবীন্দ্রসঙ্গীত-লিপি, রাজ্যেশ্বর মিত্র ঙ্ম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত চিন্তা, সুধীর চক্রবর্তী ঙ্ম রবীন্দ্রসংগীত ও সমসাময়িক সংগীতকার, পূর্ণেন্দু প্রসাদ ভট্টাচার্য ঙ্ম রবীন্দ্রনাথের সুর-সংযোজিত বেদ ও উপনিষদের মন্ত্র, এ.এ. বাকে ঙ্ম সঙ্গীতকার রবীন্দ্রনাথ। অনুবাদ ঙ্ম কৃষ্ণা বসু।

অরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত এই গ্রন্থে বিভিন্ন লেখকদের লেখনীতে দীপ্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানের শিক্ষাপ্রসঙ্গ, স্বরসঙ্গতি ও সুরবৈচিত্র্য, স্বরলিপির তালিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে স্বরলিপির ঐতিহাসিক তাৎপর্য এবং স্বরলিপির নানা সমস্যা। সঙ্গীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও দিলীপকুমার রায় এর সঙ্গে সঙ্গীত বিষয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে সঙ্গীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণার মূল্যায়ন করেছেন রাজ্যেশ্বর মিত্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতচিন্তা নিবন্ধে। রাজ্যেশ্বর মিত্রের মূল্যায়ন হল—

> ''রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গীতচিন্তায় যে ধারা ছিল তা শাস্ত্র বা ইতিহাসকে অবলম্বন করেনি, তা তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকেই

সম্যকভাবে আশ্রয় করেছে। জীবনের নানা অবকাশে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন কিন্তু কৈশোর থেকে সুপরিণত বয়স পর্যন্ত তাঁর মতবাদের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি।"[১৪]

গ্রন্থে রবীন্দ্র সমসাময়িক গীতিকার ও সুরকারদের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় গীতিকার ও সুরকার রবীন্দ্রনাথের অসামান্যতা প্রমাণিত হয়। এ বিষয়ে সুধীর চক্রবর্তীর বক্তব্য হল,

"প্রতিভার সবচেয়ে বড়ো লক্ষণ ফুটে ওঠে নিজস্ব আঙ্গিক নির্মাণে, অর্থাৎ গানের ক্ষেত্রে ঘরাণার সৃষ্টিতে। সেই কাজে অত্যাবশ্যক হ'ল দেশের দীর্ঘবাহিত গানের ধারাকে আত্মস্থ করে, নতুন সৃষ্টির উপকূলে পৌঁছানোর অদ্বৈধ ব্যাকুলতা। রবীন্দ্রনাথ এই অর্থে বাংলাগানের সিদ্ধপুরুষ এবং সেইজন্য গানই তাঁর আত্মপ্রকাশের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পরূপ।"[১৫]

এই প্রবন্ধসঙ্কলিত গ্রন্থে পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথের সুর সংযোজিত বেদ গানগুলির মূল ভাষ্য ও তার অনুবাদের মধ্যে প্রাপ্ত রবীন্দ্রসৃজনকুশলতার দিকটিই প্রতিফলিত করেছেন। ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধারায় মুক্তিপ্রিয় রবীন্দ্রনাথকেই উপস্থাপিত করেছেন এ. এ. বাকে তাঁর লেখনীতে, যা অনুবাদ করেছেন কৃষ্ণা বসু। বাকে-র ভাবনায় ধরা পড়ে—

"সাধারণভাবে সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর ধারণা এবং বিশেষভাবে গীতরচনা সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধি তাঁর সমগ্র অস্তিত্বের স্বাভাবিক অনুভূতিময় প্রকাশ। যে কোন দিক থেকেই এই

আশ্চর্য মানুষটির দিকে তাকালে এই সত্যই উপলব্ধি হবে।
তাঁর প্রতিভার মূলে অনবরত কাজ করেছে মুক্তিচেতনা
এবং আত্মোপলব্ধির এই যুগ্মধারা।”[১৬]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতজীবনের আলোকে আলোকিত বিভিন্ন লেখকের লেখনীকে রবীন্দ্রসঙ্গীত জিজ্ঞাসুদের সামনে উপস্থিত করে সমালোচক রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীতের মূল্যায়ন করেছেন।

।। পাঁচ।।

অরুণ ভট্টাচার্য-র ‘রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্বরসঙ্গতি ও সুরবৈচিত্র্য’ গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে। গ্রন্থে আলোচিত বিষয়টিকে নিয়ে গ্রন্থের নামে একই শিরোনামযুক্ত প্রবন্ধ আগে প্রকাশ পেয়েছে পত্রপত্রিকায়, সঙ্কলনগ্রন্থ ইত্যাদিতে। স্বতন্ত্র গ্রন্থে বিষয়টিকে নিয়ে লেখক বিস্তারিত ভাবনার উপস্থাপন করেছেন। গ্রন্থের বিষয়সূচিতে রয়েছে—

রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্বরসঙ্গতি ও সুরবৈচিত্র্য, গানগুলি— ১. দুঃখরাতে হে নাথ, কে ডাকিলে, ২. ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার, ৩. মেঘছায়ে সজল বায়ে মন আমার, ৪. মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার করে আসে, ৫. প্রখর তপনতাপে আকাশ তৃষায় কাঁপে, ৬. কখন দিলে পরায়ে স্বপনে বরণমালা, ব্যথার মালা, ৭. বড়ো বেদনার মতো বেজেছ তুমি হে, ৮. অন্ধজনে দেহো আলো মৃতজনে দেহো প্রাণ। সুর বিশ্লেষণের পদ্ধতি ও বিন্যাস।

লেখক এই গ্রন্থে জানিয়েছেন যে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর এই গবেষণায়

সম্পূর্ণ নতুন এক পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেছেন। লেখকের গবেষণার মূল বিষয়বস্তু হল কয়েকটি গানের সুর-কাঠামো আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরসঙ্গতি ও সুরবৈচিত্র্যের এক ছবি ফুটিয়ে তোলা।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক রবীন্দ্রনাথের পূজা, প্রেম ও প্রকৃতি পর্যায় থেকে আটটি গানকে আলোচনায় বিষয়ীভূত করে গানগুলির স্বরসঙ্গতি ও সুরবৈচিত্র্যের বিশ্লেষণ করেছেন, বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে লেখক প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে রবীন্দ্রনাথের গানে কাব্যধর্মিতা ও তৎসংলগ্ন ভাবপ্রসঙ্গ বাদ দিলেও শুধুমাত্র সুরের জোরেই এ গান চিরকাল বেঁচে থাকবে। যদিও যারা অত সুর বোঝেন না তারা তো শুধু কাব্যগুণেও এ গানের একান্ত ভক্ত, এ কথা আমাদের মনে রেখেই লেখকের মতকে সম্মান দেখানো উচিত। সুরের বিশ্লেষণকে আশ্রয় করে লেখকের এই গবেষণায় গানগুলির সুর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখক মূলত বারোটি পদ্ধতিকে আশ্রয় করেছেন। সেগুলো হল—

> "১. গীত রচনা সম্পর্কিত যথাসম্ভব প্রাথমিক ইতিহাস, ২. স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, ৩. তাল বিভাগ, ৪. সুরের আরোহ, অবরোহ এবং গতি নির্ণয়, ৫. যে যে স্বরসমষ্টি বার বার একটি গানে ঘুরে ফিরে এসেছে তার নির্দেশ, ৬. সুরের সপ্তকব্যাপী সঞ্চরণ—গানগুলিকে রাগের পূর্বাঙ্গ উত্তরাঙ্গ জাতীয় স্বরূপ নিরূপণ, ৭. রাগনির্ণয় করা সঙ্গত কিনা—কোন রাগে রাগরাগিনীর রূপ কিভাবে এসেছে এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতকে রাগ চিহ্নিত করার কোন প্রয়োজন আছে কিনা, ৮. টপ্পার ব্যবহার, ৯. তান এর ব্যবহার, ১০. মীড় ও অন্যান্য

অলংকরণ বৈশিষ্ট্য, ১১. একাধিক স্বরলিপি থাকলে তার

তুলনামূলক বিচার, ১২. গানের অঙ্গ ও গায়কী বিশ্লেষণ।"[১৭]

লেখক প্রদত্ত ১২টি সূত্র রবীন্দ্রনাথের গানের সুর বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে এক নতুন পথ দেখায়। এই গ্রন্থে কথা ও সুরের পারস্পরিক সৌহার্দ্যে রবীন্দ্রগানের বৈশিষ্ট্যের পাশে শুধুমাত্র সুর বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সৃজন শৈলীর সঙ্গে সর্বভারতীয় সঙ্গীত ঐতিহ্যের তুলনামূলক বিচার করে লেখক প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, এ গান

"এক প্রকার ক্ল্যাসিক্যাল গানের পর্যায়ে পড়ে গিয়েছে।"[১৮]

রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চায় এই গ্রন্থের লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী, বিশ্লেষণ ভঙ্গী, ভাবের গভীরে প্রবেশ করে যুক্তি পারম্পর্য আমাদের নতুন ভাবনা সঞ্চারে সাহায্য করবে।

রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চায় গীতবিতানের পাশাপাশি যে গ্রন্থটি প্রথমেই আবশ্যিক বলে মনে হয় তা হল রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-এর 'গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচি।' রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থের ধারাবাহিক প্রকাশের ইতিহাসে 'গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচি প্রথম খণ্ড' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালের মে মাসে। এই গ্রন্থের পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে। দ্বিতীয় সংস্করণের পর্যবেক্ষণে পাই গ্রন্থ মধ্যে কালানুক্রমিকভাবে ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথের বিলাত যাত্রাকাল পর্যন্ত ৯৮৫টি গান সঙ্কলিত হয়েছে। গীতবিতানে পর্যায়ানুসারে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানগুলির যে সংকলন করেছেন, সেখানে কালানুক্রমিক ভাবে গানগুলি সংকলিত হয়নি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সংকলন ও সম্পাদনায় গ্রন্থটির মধ্যে রবীন্দ্রানুরাগী, গবেষক, রবীন্দ্রতথ্যানুসন্ধানীরা রবীন্দ্রনাথের গানের কালানুক্রমিক সূচির মধ্যে প্রতিটি গানের সংশ্লিষ্ট বিষয় হিসাবে গানের প্রকাশকাল, স্বরবিতান সংখ্যা, কোন কাব্যগ্রন্থাবলীভুক্ত, গানের

পাঠান্তর-সুরান্তর, স্বরলিপিকার ইত্যাদি তথ্য সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে জানতে পারবেন। ‘ গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচি’র দুই খণ্ড পৃথকভাবে গ্রন্থাগারে পর্যবেক্ষণের সুযোগ আমরা পেয়েছি। কিন্তু বর্তমানে অখণ্ড ‘গীতিবিতান কালানুক্রমিক সূচি’, যার প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯৯২ সালে, আর সংগৃহীত আলোচ্য গ্রন্থটি অখণ্ড সূচিগ্রন্থের সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রকাশ কাল হল ডিসেম্বর ২০০৩, যা পরিমার্জন ও সম্পাদনায় ছিলেন প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ অরুণকুমার বসু। তাঁর অসাধারণ সম্পাদনা নৈপুণ্যে গ্রন্থটি আরও তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। ১৯৭৩ সালের প্রথম খণ্ডে যেখানে ১৯১২ সাল অবধি কবির বিলাত যাত্রা পর্যন্ত রচনার ক্রমে ৯৮৫টি গানের সন্ধান মেলে, ২০০৩ এর সংগৃহীত গ্রন্থে ১৯১২ সাল পর্যন্ত কবির বিলাত যাত্রা অবধি গানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০১২টি তে। গীতিবিতানের পাশে ‘গীতবিতান কালানুক্রমিক গ্রন্থ’ যথার্থ অর্থে রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চায় সহায়ক একটি গ্রন্থ।

।। **ছয়**।।

প্রিয়ব্রত চৌধুরী লিখিত ‘রবীন্দ্রসঙ্গীত (লোকগীতি, কীর্তন ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাব)’ গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে। গ্রন্থসূচিতে রয়েছে—

প্রথম অধ্যায়—প্রাক্ রবীন্দ্রযুগে বাংলাদেশে হিন্দুস্থানী ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত এবং বাংলা অভিজাত, অর্ধ-অভিজাত ও লোকসঙ্গীত ইত্যাদি অনুশীলন। বাংলার প্রাচীন সঙ্গীত বাংলা দেশের যাত্রা ও রঙ্গমঞ্চের সঙ্গীত বৈচিত্র্য এবং বাংলার বিবিধ সঙ্গীত, আধুনিক সাহিত্য ও সঙ্গীত, হিন্দুস্থানী ক্ল্যাসিক্যাল বা উচ্চাঙ্গসঙ্গীত ও বাংলাদেশ, বাংলার পল্লীসঙ্গীত বা লোকগীতি, উল্লেখপঞ্জী।

দ্বিতীয় অধ্যায়— ঠাকুরবাড়ির সঙ্গীত-সংস্কৃতি, দ্বারকানাথ ও দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গীতসাধনা এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতমানসে তার প্রতিফলন, রবীন্দ্রাগ্রজদের সঙ্গীত অনুশীলন বা সঙ্গীতচর্চা ও রবীন্দ্র সঙ্গীত মানসে তার প্রভাব, উল্লেখপঞ্জী।

তৃতীয় অধ্যায়—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতশিক্ষা, উল্লেখপঞ্জী।

চতুর্থ অধ্যায়— সঙ্গীতশিল্পী রবীন্দ্রনাথ, উল্লেখপঞ্জী।

পঞ্চম অধ্যায়— রবীন্দ্রসঙ্গীতে হিন্দুস্থানী ক্লাসিক্যাল বা ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রভাব—১. ধ্রুপদ প্রকৃতির রবীন্দ্রসঙ্গীত, ২. ধামার প্রকৃতির রবীন্দ্রসঙ্গীত, ৩. খেয়াল প্রকৃতির রবীন্দ্রসঙ্গীত, ৪. টপ্পা প্রকৃতির রবীন্দ্রসঙ্গীত, ৫. ঠুংরী প্রকৃতির রবীন্দ্রসঙ্গীত, ৬. বিবিধ ক্ল্যাসিক্যাল প্রকৃতির রবীন্দ্রসঙ্গীত, উল্লেখপঞ্জী।

ষষ্ঠ অধ্যায়— রবীন্দ্রসঙ্গীতে বাংলা লোকগীতির প্রভাব—১. রামপ্রসাদী সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত, ২. সারি সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত ৩. কীর্তন সুরে (ভাঙা কীর্তন) রবীন্দ্রসঙ্গীত ৪. বাউল সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত ৫. বিবিধ পল্লীসুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত, উল্লেখপঞ্জী।

সপ্তম অধ্যায়— রবীন্দ্রসঙ্গীতে কীর্তনের প্রভাব—ক) ভানুসিংহের পদাবলী, খ) কীর্তন-প্রকৃতির রবীন্দ্রসঙ্গীত, উল্লেখপঞ্জী। গ্রন্থপঞ্জী, নির্দেশিকা।

সাতটি অধ্যায়ের দীর্ঘ আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সৃষ্টির বহুমাত্রিকতার কথাই গবেষক উপস্থাপিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলার নানা ধরনের সঙ্গীত, ঠাকুরবাড়ির পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত মননশীল চিন্তার মাধ্যমে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্রম সমৃদ্ধি ও উত্তরণের এক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে গ্রন্থটিতে। রবীন্দ্রসঙ্গীতে নানা ধারার সঙ্গীতপ্রভাব থাকলেও এ এক স্বতন্ত্রধারার গীতশ্রেণি, তা-ই বার বার ধরা পড়েছে তাঁর লেখনীতে। সমালোচকের মতে রবীন্দ্রনাথের গানে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ইত্যাদি অঙ্গের গানগুলিতে ভারতবর্ষে প্রচলিত অন্যান্য

ঘরানা থেকে বিষ্ণুপুরী ঘরানার প্রভাবই অধিক যদিও বিষ্ণুপুরী ঘরানা ছাড়াও তদানীন্তন সময়ে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সে সকল ঘরানা কলকাতা ও বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে প্রচলিত ছিল সেগুলিও অল্পবিস্তর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতমানস ও সঙ্গীত রচনাকে প্রভাবিত করেছিল। লেখকের লেখনীতে রবীন্দ্র অনুরাগীরা এই সত্যে উপনীত হবেন যে রবীন্দ্রসঙ্গীত ভারতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারার সঙ্গীতের এক অসামান্য সম্মিলিতরূপের প্রকাশ, যা রবীন্দ্রসৃজনের মৌলিকত্বে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। তবে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের অঙ্গনে ভারত তথা বাংলা পেরিয়ে বিশেষ করে সুরগত দিক দিয়ে পাশ্চাত্য ধারার যে বাঁধুনি রয়েছে তা বলতে গেলে সমালোচক তাঁর গ্রন্থে অনালোচিতই রেখেছেন। এ বিষয়ে গ্রন্থের নামটিই অবশ্য ইঙ্গিতবাহী। রবীন্দ্রসঙ্গীতচর্চায় গ্রন্থটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরধারার অনুমান নির্ণয়ে সহায়ক, সন্দেহ নেই।

সূত্রনির্দেশ—

১। অরুণকুমার বসু, বাংলা কাব্যসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত, দে'জ, কলকাতা, ২০১০, পৃঃ-২৫৩।

২। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথের গান, বৈতানিক প্রকাশনী, কলকাতা-২০, পৃঃ-১২-১৩।

৩। তদেব, পৃঃ-৬৯।

৪। বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রসঙ্গীতের নানাদিক, মিত্রালয়, কলকাতা, মে ১৯৬২, অবতরনিকা।

৫। তদেব, অবতরণিকা, (পৃষ্ঠা উল্লেখ করা হয়নি)

৬। তদেব, পৃঃ-৮৩-৮৪।

৭। সুবিনয় রায়, রবীন্দ্রসঙ্গীত সাধনা, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃঃ-৮০।

৮। তদেব, পরিশিষ্ট

৯। শ্রী প্রফুল্লকুমার দাস, রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গ দ্বিতীয় খণ্ড, জিজ্ঞাসা পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, নভেম্বর ২৪, ২০০৭, পৃঃ-১০৪, ১০৫।

১০। তদেব, পৃঃ-১১০-১১১।

১১। জয়দেব রায়, রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিমণ্ডল, রসচক্র সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৬৫, পৃঃ-৩,১৯,২০।

১২। তদেব, পৃঃ-২৫।

১৩। তদেব, পৃঃ-১২৩।

১৪। অরুণ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), রবীন্দ্রসঙ্গীতের নানাদিক, সঙ্গীত পরিষদ, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃঃ-১০৩।

১৫। তদেব, পৃঃ-১৩৬।

১৬। তদেব, পৃঃ-১৫৬।

১৭। অরুণ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্বরসঙ্গতি ও সুরবৈচিত্র্য, সঙ্গীত পরিষদ, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃঃ-১২৬।

১৮। তদেব, পৃঃ-১২৭।